৪৭তম লিখিত বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা

বাংলা : ১ + আন্তর্জাতিক : ১

মোট সময় : ২ ঘন্টা (নমুনা উত্তরপত্র)

[দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে]

বাংলা- ১

[১. খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।
২. শুধু টেকনিক্যাল ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ৩নং প্রশ্নের উত্তর লেখার প্রয়োজন নেই।]

১. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : **নম্বর** ৬×৫ = ৩০

** নির্দেশনা : প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

ক. উৎস অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলা ভাষার শব্দকে উৎপত্তিগত দিক দিয়ে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ ভাগগুলো হলো : তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ। তবে বর্তমানে অর্ধ-তৎসম শব্দকে তৎসম শব্দ ধরে ৪ ভাগে ভাগ করার পক্ষে মতবাদ আছে।

১. তৎসম শব্দ : সংস্কৃত ভাষার যে-সব শব্দ পরিবর্তিত না হয়ে সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেসব শব্দকেই বলা হয় তৎসম শব্দ। উদাহরণ- চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, মনুষ্য ইত্যাদি।

২. অর্ধ-তৎসম শব্দ : যেসব সংস্কৃত শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় অর্ধ-তৎসম। যেমন, জ্যোৎস্না < জ্যোছনা, শ্রাদ্ধ < ছেরাদ্দ, গৃহিণী < গিন্নী, বৈষ্ণব < বোষ্টম, কুৎসিত < কুচ্ছিত।

৩. তদ্ভব শব্দ : বাংলা ভাষা গঠনের সময় প্রাকৃত বা অপভ্রংশ থেকে যে সব শব্দ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছিলো, সেগুলোকেই বলা হয় তদ্ভব শব্দ। যেমন- সংস্কৃত 'হস্ত' শব্দটি প্রাকৃততে 'হত্থ' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আর বাংলায় এসে সেটা আরো সহজ হতে গিয়ে হয়ে গেছে 'হাত'। তেমনি, চর্মকার < চম্মআর < চামার ইত্যাদি।

৪. দেশি শব্দ : বাংলা ভাষাভাষীদের ভূখণ্ডে অনেক আদিকাল থেকে যারা বাস করতো, সেইসব আদিবাসীদের ভাষার যে সব শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সে সব শব্দকে বলা হয় দেশি শব্দ। এই আদিবাসীদের মধ্যে আছে- কোল, মুণ্ডা, ভীম, ইত্যাদি। মেমন, কুড়ি (বিশ)- কোলভাষা, পেট (উদর)- তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)- মুণ্ডারী ভাষা।

৫. বিদেশি শব্দ : বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা অন্য ভাষাভাষীর মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের ভাষা থেকে যে সব শব্দ গ্রহণ করেছে, বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারে অন্য ভাষার শব্দ গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় বিদেশি শব্দ।

আরবি শব্দ : ঈমান, ওযু, কোরবানি ইত্যাদি।
ফারসি শব্দ : কারখানা, চশমা, দস্তখত ইত্যাদি।
ইংরেজি শব্দ : চেয়ার, টেবিল, আফিম, স্কুল হাসপাতাল ইত্যাদি।
পর্তুগিজ শব্দ : আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা ইত্যাদি।
ফরাসি শব্দ : কার্তুজ, কুপন , ডিপো, রেস্তোঁরা ইত্যাদি।
ওলন্দাজ শব্দ : ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি।
গুজরাটি শব্দ : খদ্দর, হরতাল ইত্যাদি।
পাঞ্জাবি শব্দ : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।
তুর্কি শব্দ : চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।
চিনা শব্দ : চা, চিনি, লুচি ইত্যাদি।
মায়ানমার/ বর্মি শব্দ : ফুঙ্গি, লুঙ্গি ইত্যাদি।
জাপানি শব্দ : রিক্সা, হারিকিরি ইত্যাদি।

খ. 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুযায়ী নিচের শব্দগুলোর বানান সংশোধন করুন এবং কেন অশুদ্ধ তা লিখুন: পদবী, মূর্চ্ছা, কৃতীত্ব, এসিড, ধরণ, মিসন।

* যেসব তৎসম শব্দের বানানে ই, ঈ-কার উভয়ই শুদ্ধ সেসব শব্দে কেবল ই-কার হবে। যেমন : কিংবদন্তি, শ্রেণি, তরণি, পদবি ইত্যাদি।
* তৎসম শব্দে রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্জন, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি।
* তৎসম শব্দে ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন : কৃতিত্ব, দায়িত্ব, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।
* বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : অ্যাকাউন্ট, অ্যাসিড, ব্যাংক, ম্যানেজার ইত্যাদি।
* অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহৃত হয় না। যেমন : অঘ্রান, ধরন, পরান ইত্যাদি।
* অতৎসম শব্দে ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন : পাসপোর্ট, টেলিভিশন, মিশন, সেশন ইত্যাদি।

গ. নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন :

i. গরু-ছাগলের বিরাট হাট।
শুদ্ধ : গোরু-ছাগলের বিরাট হাট।

ii. সব পাখিরা নীড় বাঁধে না।
শুদ্ধ : সব পাখি নীড় বাঁধে না।

iii. তার সাথে আমার সখ্যতা আছে।
শুদ্ধ : তার সাথে আমার সখ্য আছে।

iv. ছেলেটি দুর্দান্ত মেধাবী।
শুদ্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।

v. দুর্বিসহ যন্ত্রণায় ভুগছি।
শুদ্ধ : দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভুগছি।

vi. আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি।
শুদ্ধ : আমি গীতাঞ্জলি পড়েছি।

ঘ. নিচের প্রবাদগুলোর নিহিতার্থ লিখে বাক্যে প্রয়োগ করুন :

মশা মারতে কামান দাগা; মাছের মায়ের পুত্রশোক; এক মাঘে শীত যায় না; গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল; ধরি মাছ না ছুঁই পানি; চোখে সরষে ফুল দেখা।

মশা মারতে কামান দাগা : (তুচ্ছ কাজে বেশি শক্তি প্রয়োগ) – সামান্য অপরাধের জন্য আইন-আদালত, এই যে দেখছি মশা মারতে কামান দাগা।

মাছের মায়ের পুত্রশোক : (মিথ্যা শোক)– দরিদ্রদের জন্য রাজনীতিবিদদের দরদ্‌টা মাছের মার পুত্রশোকের মতই।

এক মাঘে শীত যায় না : (বিপদ এক বারই আসে না)– আমার এ বিপদে আমাকে একলা ফেলে চলে যেও না, মনে রেখ এক মাঘে শীত যায় না।)

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল : (প্রাপ্তির আগেই ভোগের আয়োজন)– খেলা শুরু না হতেই জয়ের চিন্তা করছ, এ যে দেখি গাছে কাঁঠাল গোফে তেল।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি : (কৌশলে কার্যোদ্ধার)– তোমাকে এই ধরি মাছ না ছুঁই পানি চিন্তা ধারা থেকে সরে আসতে হবে।

চোখে সরষে ফুল দেখা : (বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়া)– প্রশ্নপত্র কিছুই কমন আসেনি দেখে ছাত্রটি চোখে সরষে ফুল দেখছে।

ঙ. নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন :

১. যা তার প্রাপ্তি তাই তার দান। (সরল বাক্য)
সরল : দানেই তার প্রাপ্তি ।

২. তারা নিয়মিত শিক্ষার্থী নয়। (অস্তিবাচক বাক্য)]
অস্তিবাচক : তারা অনিয়মিত শিক্ষার্থী।

৩. সৎ লোকের ভয় নেই। (জটিল বাক্য)
জটিল : যে সৎ লোক তার ভয় নেই।

৪. দশ মিনিট পর ঘাটে নৌকা ভিড়ল। (যৌগিক বাক্য)
যৌগিক : দশ মিনিট পার হলো, তারপর নৌকা ঘাটে ভিড়ল।

৫. শিশুরা দূষণমুক্ত পরিবেশ চায়। (নেতিবাচক বাক্য)
নেতিবাচক : শিশুরা দূষিত পরিবেশ চায় না।

৬. কী মজার গল্প! (নির্দেশাত্মক বাক্য)
নির্দেশাত্মক : গল্পটি বেশ মজার।

২। **সারমর্ম লিখুন:** ২০

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।
এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়–
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

** **নির্দেশনা :** ৩/৪টি সরল বাক্যে সারমর্ম লিখতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর ১২-১৪, এভারেজ নম্বর ৯-১১। প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।

সারমর্ম : আঠারো বছর বয়স প্রবল আবেগ ও জীবনে ঝুঁকি নেওয়ার বয়স। এ-বয়সে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জীবন ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। অদম্য প্রাণশক্তি, দুর্বার সাহসিকতা, নবজীবনের স্বপ্ন রূপায়ণে এ বয়স হতে পারে জাতির অগ্রযাত্রার চালিকাশক্তি।

৩। **সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে আপনার অভিমত জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিখুন।** ১৫

** **নির্দেশনা :** পত্রিকার সম্পাদকের নিকট বিষয়বস্তু উল্লেখ করে অভিমতটি প্রকাশের অনুমতি চাইবেন। বর্তমান অবস্থার কারণ ও প্রতিকারের জন্য করণীয় জানাবেন এবং শেষে খাম আঁকবেন। সর্বোচ্চ নম্বর ১১-১২, এভারেজ নম্বর ৯-১০। প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

তারিখ : ৬ অক্টোবর, ২০২৫
সম্পাদক,
দৈনিক ইত্তেফাক
১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।
বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশের জন্য 'সড়ক দুর্ঘটনা রোধের উপায়' শিরোনামের একটি চিঠি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে তা প্রকাশের সুযোগ করে দিলে বাধিত হব।
বিনীত
'খ'
পীরগঞ্জ, রংপুর।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটা দুর্ঘটনা-সারা জীবনের কান্না' –এ স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর। আজকাল আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন টিভির পর্দায় আর পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে সড়ক দুর্ঘটনার মর্মান্তিক খবর। এতে কত মূল্যবান প্রাণ অকালে ঝরে পড়ছে, কত পরিবার পথে বসছে, সেই অশ্রুসজল করুণ মুখের হিসাব কেউ রাখে না। একটি পত্রিকার তথ্য মতে, ২০২৪ সালে প্রায় সাড়ে আট হাজার সড়ক দুর্ঘটনায় এগার হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের সামনে পিতার রক্তাক্ত নিথর দেহ এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। এটি এখন জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে চালকদের মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব, নেশাগ্রস্ত হয়ে গাড়ি চালানো, ওভারটেকিংয়ের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক, ট্র্যাফিক আইন অমান্য করা, এবং দূরপাল্লার চালকদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নেওয়া। এছাড়া, রাস্তার দুরবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা, এবং অপর্যাপ্ত ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন:

১. কঠোর আইন প্রয়োগ: চালকদের লাইসেন্স দেওয়ার আগে কঠোর প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। মদ্যপান করে গাড়ি চালানো বা বেপরোয়া গাড়ি চালালে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে।
২. সচেতনতা বৃদ্ধি: গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার চালানো উচিত। চালক ও পথচারীদের ট্র্যাফিক নিয়মাবলী সম্পর্কে শিক্ষিত করতে হবে।
৩. রাস্তার উন্নয়ন: নিয়মিতভাবে রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ, গর্ত ভরাট করা, এবং পর্যাপ্ত ট্র্যাফিক সংকেত ও বাতি স্থাপন করা জরুরি।
৪. পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন: গণপরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও উন্নত করা দরকার, যাতে মানুষ ব্যক্তিগত গাড়ির উপর নির্ভরশীল না হয়।
৫. দুর্ঘটনা নিরূপণ ও প্রতিরোধ: দুর্ঘটনার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই গুরুতর সমস্যা সমাধানে সরকার, ট্র্যাফিক বিভাগ এবং সাধারণ নাগরিক—সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আশা করি, আপনার পত্রিকার মাধ্যমে এই বার্তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাবে এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আশা করি, উপযুক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক—
'খ'
পীরগঞ্জ, রংপুর।

	ডাকটিকেট
প্রেরক	প্রাপক
'খ'	সম্পাদক,
পীরগঞ্জ, রংপুর।	দৈনিক ইত্তেফাক
	১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

আন্তর্জাতিক : ১

[খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।]

নম্বর

১. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন : ৪ × ১০ = ৪০

(ক) **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য কী?**

**** নির্দেশনা :** সর্বোচ্চ নম্বর ৩.৫, এভারেজ নম্বর ২.৫-৩। কনসেপ্ট সঠিক না হলে শূন্য পেতে পারে। প্রতি ৩টি ভুল বানানের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।

উত্তর : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হলো রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় জোট, এনজিও ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক যোগাযোগ, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং সংঘাতসংক্রান্ত বিষয়সমূহের একটি সামগ্রিক অধ্যয়ন।

অপরদিকে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-শাখা, যেখানে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা, স্বার্থ, কূটনীতি, সামরিক কৌশল এবং নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক আচরণ ও প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণ করা হয়।

নিচে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য দেয়া হল:

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	আন্তর্জাতিক রাজনীতি
উদ্দেশ্য : সম্পর্ক উন্নয়ন	উদ্দেশ্য : ক্ষমতা অর্জন
নীতিনৈতিকতাপূর্ণ ও আদর্শিক	আদর্শিক নয়; বরং অতি বাস্তবিক
সম্পর্ক রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক উভয়ই হতে পারে	শুধুই রাজনৈতিক
ক্ষেত্র ব্যাপক	সম্পর্কের একটি অংশ মাত্র
উদাহরণ: জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্যারিস চুক্তি	উদাহরণ: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

(খ) **ক্ষমতার ভারসাম্য (Balance of power) কী?**

উত্তর : ক্ষমতার ভারসাম্য বা শক্তিসাম্য বলতে বোঝায় একাধিক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য। এটি এমন এক ধরনের ভারসাম্য, যার সাহায্যে একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের ওপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভবপর হয়। কোনো একটি রাষ্ট্র যাতে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, সেজন্য শক্তিসাম্য ধারণাটির জন্ম।

প্রফেসর সিডনি বে ফে (Professor Sydney B Fay) শক্তিসাম্যের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'শক্তিসাম্যের অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শক্তির এমন একটি সঠিক সাম্যাবস্থা, যা যে-কোনো একটিকে বাধা দেবে এমন অধিক শক্তিশালী হতে, যাতে সে অপরের ওপর তার ইচ্ছাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে না পারে।' সেয়ার্জেন বার্গার (Professor Schwanzen Berger) বলেন, 'Balance of power is cenrtain abount of stability in international relations'. ফ্রাংকেল এর মতে, শক্তিসাম্য বলতে ভারসাম্যহীন একটা প্রবণতাকে বোঝায়। শক্তি সাম্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাজনীতি একটা ভারসাম্যহীন পথে অগ্রসর হয়।

উদাহরণস্বরূপ, স্নায়ু যুদ্ধের (Cold War) সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর নেতৃত্বে দুটি সামরিক জোট (NATO এবং Warsaw Pact) একে অপরের বিরুদ্ধে শক্তির ভারসাম্য বজায় রেখেছিল, যা বিশ্বকে একটি বড় ধরনের সরাসরি যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছিল। যখন কোনো একটি রাষ্ট্র অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে, তখন অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে তার বিরুদ্ধে জোট গঠন করে। এটাই শক্তির ভারসাম্যের মূল কথা।

(গ) **আন্তর্জাতিক সম্পর্কে embedded liberalism ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।**

উত্তর : Embedded liberalism বা অন্তর্নিহিত উদারনীতিবাদ শব্দটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অভিমুখকে বোঝায়। এই ব্যবস্থাটি রাষ্ট্রগুলির কল্যাণের ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং বেকারত্ব হ্রাস করার জন্য তাদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতার সাথে মুক্ত বাণিজ্যের সংমিশ্রণকে সমর্থন করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শব্দটি প্রথম আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন রাগি ১৯৮২ সালে ব্যবহার করেছিলেন।

Embedded liberalism এর উদাহরণ হচ্ছে-

ব্রেটন উডস সিস্টেম (১৯৪৪-১৯৭০) : আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং স্থির-কিন্তু-নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিনিময় হারের একটি ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল।

মার্শাল পরিকল্পনা (১৯৪৮-১৯৫২) : মার্কিন সাহায্য পশ্চিমা ইউরোপীয় অর্থনীতিগুলিকে পুনরুদ্ধার, শিল্প পুনর্নির্মাণ এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যে একীভূত করার সময় কল্যাণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে সহায়তা করেছিল।

(ঘ) ব্যাক চ্যানেল কূটনীতি কী?

উত্তর : ব্যাকচ্যানেল কূটনীতি হলো দুটো দেশ বা পক্ষের মধ্যে গোপনে পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক আলোচনা। দুটি আলাদা দেশ বা একই দেশের দুটি বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি, যাদের একে অপরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু কোনো প্রয়োজনে তারা যে মাধ্যম বা মধ্যস্থতাকারী ব্যবহার করে আলোচনার টেবিলে একত্র হয়, এই মাধ্যম, মধ্যস্থতাকারী, সেই স্থান সব কিছু মিলিয়ে বলা হয়, ব্যাকচ্যানেল কূটনীতি। একে Track II Diplomacy বা দ্বৈত ট্র্যাক কূটনীতিও বলা হয় ।

যেমন— সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সিঙ্গাপুরে। যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও তারা আলোচনার টেবিলে বসে। সেক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াকে ব্যাকচ্যানেল কূটনীতি বলা হয়। এ কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো দুটি বিবদমান পক্ষের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ স্থাপন করে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিয়ে সম্ভাব্য সংঘাত প্রশমন বা হ্রাস করা। বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানি, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন বা সংস্থার মাধ্যমে দুটি দেশের মধ্যে ব্যাকচ্যানেল কূটনীতি পরিচালিত হয়ে থাকে।

এ ধরণের কূটনীতির একটি সমস্যা হচ্ছে কূটনৈতিক কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হওয়ার পর যখন এটি জনগণের সামনে আসে তখন একটা অংশ এর ফলাফলকে ভালোভাবে নিতে পারে না, এবং এর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

(ঙ) পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর : পররাষ্ট্রনীতি হলো কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের গৃহীত সেসব নীতি যা রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে সম্পাদন করে থাকে। পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো হলোঃ

ভৌগোলিক অবস্থান– দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র, সমুদ্র বা স্থলভাগে অবস্থান পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে।

অর্থনৈতিক অবস্থা– জাতীয় অর্থনীতি, সম্পদ, শিল্প-কারখানা, আমদানি–রপ্তানি সক্ষমতা ইত্যাদি পররাষ্ট্রনীতির দিকনির্দেশনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নেতৃত্ব– গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা এবং শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে।

জনমত ও জাতীয় স্বার্থ– জনগণের অভ্যন্তরীণ চাহিদা, সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক পরিচয় ও জাতীয় স্বার্থ পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য নির্ধারণে বড় উপাদান।

সামরিক শক্তি– প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্ষমতা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি পররাষ্ট্রনীতির কৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

সংবিধান ও আইন– সংবিধানে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি, শান্তি ও সহযোগিতা বিষয়ক অঙ্গীকার ইত্যাদি পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে।

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উপাদান– ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশের অবস্থানকে প্রভাবিত করে।

(চ) সুনীল অর্থনীতি (Blue economy) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : সুনীল অর্থনীতি বা Blue economy হচ্ছে সমুদ্রের সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি। সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ও এর তলদেশের বিভিন্ন প্রকার সম্পদকে কাজে লাগানোর অর্থনীতি। অর্থাৎ, সমুদ্র থেকে আহরণকৃত যে কোন সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয়, তাই সুনীল অর্থনীতি।

সর্বপ্রথম ১৯৯৪ সালে বেলজিয়ামের অধ্যাপক গুন্টার পাউলি কোন দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য একটি টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব মডেল হিসেবে সুনীল অর্থনীতির ধারণা দেন। বর্তমানে সমুদ্র অন্যতম মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। সমুদ্র, মাছ এবং মত্স্য সম্পদের মাধ্যমে খাবার চাহিদা মেটায়, মানুষ এবং পন্য পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও সমুদ্র নানা ধরনের প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ যেমন বালি, লবণ, কবাল্ট, গ্রাভেল, এবং কপার ইত্যাদির আধার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তেল ও গ্যাস আহরণ ক্ষেত্র হিসেবে সমুদ্র প্রয়োজন হয়। এসব উপাদান সমষ্টিকেই বলা হয় সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)| সুনীল অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা, সামাজিক পুঁজির সৃষ্টি করা, আয় বাড়ানো এবং সর্বোপরি পরিবেশে সঞ্চয়-বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা।

(ছ) ন্যাটোর (NATO) মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : ন্যাটো (NATO)- একটি সামরিক জোট যা ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল| ন্যাটো (NATO)-এর মূল উদ্দেশ্য হলো এর সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক ও সামরিক স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং যৌথ সামরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ন্যাটোর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

সদস্য দেশগুলোর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা: ন্যাটো একটি সম্মিলিত নিরাপত্তা চুক্তি, যার অধীনে সদস্য দেশগুলো একে অপরের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ।
যৌথ সামরিক সহযোগিতা: জোটের দেশগুলো একে অপরের সামরিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে, যা একটি শক্তিশালী সামরিক জোট হিসেবে ন্যাটোকে গড়ে তুলেছে।
সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন প্রতিহত করা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিস্তৃতি প্রতিরোধের জন্য ন্যাটো গঠন করা হয়েছিল।
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি: ন্যাটো কেবল একটি সামরিক জোট নয়, এটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(জ) **'ব্রেটন উড্স' (Bretton Woods) প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।**

উত্তর : ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান বলতে মূলত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং বিশ্বব্যাংক-কে বোঝানো হয়, যা ১৯৪৪ সালের ব্রেটন উডস চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একটি স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী:
আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা: ব্রেটন উডস সিস্টেম একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পেগ সিস্টেম তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি দেশ তাদের মুদ্রার মান মার্কিন ডলারের সাথে নির্দিষ্ট করে এবং ডলার সোনার সাথে নির্দিষ্ট ছিল।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আর্থিক সহযোগিতা: এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বজুড়ে আর্থিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সহায়তা, এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রসার ঘটাতে কাজ করে।
অর্থনৈতিক উন্নয়ন: বিশ্বব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে সহায়তা করা, যার মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো নির্মাণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ।

(ঝ) দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র (rough-state) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র (Rogue State) বলতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় এমন রাষ্ট্রকে বোঝানো হয়, যারা আন্তর্জাতিক আইন, চুক্তি, কনভেনশন ও বিশ্বশান্তি বজায় রাখার প্রচলিত নিয়মকানুন মানে না এবং বারবার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আচরণ করে। ১৯৯০-এর দশকে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে এই শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয়। তখন উত্তর কোরিয়া, ইরান, ইরাক, লিবিয়া, কিউবা প্রভৃতি দেশকে প্রায়ই দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র বলা হতো।
দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে-
আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি লঙ্ঘন : জাতিসংঘ সনদ, মানবাধিকার চুক্তি বা আন্তর্জাতিক কনভেনশন অমান্য করা।
সন্ত্রাসবাদে পৃষ্ঠপোষকতা : সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসী সংগঠনকে সমর্থন, অর্থায়ন বা আশ্রয় দেওয়া।
বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি : পারমাণবিক, রাসায়নিক বা জৈবিক অস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার করার প্রবণতা।
আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি : প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা আক্রমণাত্মক আচরণ।
মানবাধিকারের লঙ্ঘন : জনগণের স্বাধীনতা হরণ, দমন-পীড়ন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অস্বীকার।

(ঞ) জলবায়ু শরণার্থী (Climate Refugee) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : জলবায়ু শরণার্থী, যাদের ইংরেজিতে বলা হয় ক্লাইমেট রিফিউজি অথবা ক্লাইমেট মাইগ্রান্ট। তাৎক্ষণিক অথবা ক্রমাগত পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে যে মানুষগুলো তাদের বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়, তাদের বলা হয় জলবায়ু শরণার্থী। জলবায়ু শরণার্থীরা নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দিতে পারে আবার দেশের অভ্যন্তরেও অন্যত্র গমন করতে পারে। জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে নিম্নলিখিত কারণে–

- খরা;
- মরুভূমিকরণ;
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি;
- বাৎসরিক আবহাওয়ার ধরনে (যেমন– মৌসুমি বায়ু) পরিবর্তন ইত্যাদি।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) তিন ধরনের জলবায়ু শরণার্থীর প্রস্তাব করেছেন।

১. জরুরি শরণার্থী (environmental emergency refugees) : যারা তাৎক্ষণিক কোনো পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে ক্ষণস্থায়ীভাবে স্থানত্যাগ করে;
২. জোরপূর্বক শরণার্থী (environmental forced refugees) : ক্রমান্বয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে যেবস মানুষ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।
৩. উদ্দেশ্যমূলক শরণার্থী (environmental motivated refugees) : সম্ভাব্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়ানোর জন্য যারা আগেই স্থান ত্যাগ করেন তারা এই শ্রেণিতে পড়েন।